بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ মোতাবেক ০৯ তবলীগ, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

উহুদের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আবু সুফিয়ানের নারাবাজির কথা হচ্ছিল, যাতে সে নিজেদের প্রতিমার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছিল। তখন আল্লাহ্ তা'লার জন্য মহানবী (সা.)-এর আত্মাভিমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। যেমনটি আমি বলেছিলাম, তখন মহানবী (সা.) অসাধারণভাবে স্বীয় আত্মাভিমান প্রকাশ করেছিলেন। আর সেই ভয়ংকর পরিস্থিতিতেও তিনি (সা.) আল্লাহ্র নাম সমুন্নত করার নারা বা ধ্বনি উচ্চকিত করিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, উহুদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ান যখন উচ্চস্বরে বলে **'লানা উয্যা ওয়া লা উয্যা লাকুম'**। অর্থাৎ, আমাদের সাহায্যার্থে আমাদের উয্যা প্রতিমা আছে, কিন্তু তোমাদের সাহায্যে কোনো প্রতিমা নেই, তখন মহানবী (সা.) মুসলমানদের বলেন, তোমরা বলো, **'লানা মওলা ওয়া লা মওলা লাকুম'**। অর্থাৎ, আমাদের অভিভাবক ও আমাদের সাহায্যকারী, আমাদের চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব খোদা আছেন, কিন্তু তোমাদের কোনো অভিভাবক এবং সাহায্যকারী নেই।" তিনি (রা.) বলেন, "এটি **'আনতা মওলানা'** (অর্থাৎ তুমি আমাদের অভিভাবক) দাবির কীরূপ মহা প্রমাণ যে, শাণিত তরবারির মুখেও তারা বলেন, আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করতে পারেন।"

আরেক স্থানে তিনি (রা.) বলেন, "মুসলমানদের কানে যখন মহানবী (সা.)-এর শাহাদতের সংবাদ পৌঁছে তখন তারা ত্বরিত (সেখানে) ফিরে আসেন এবং মহানবী (সা.)-এর ওপর থেকে লাশ সরিয়ে বুঝতে পারেন যে, তিনি (সা.) এখনও জীবিত আছেন এবং শ্বাস নিচ্ছেন। সে সময় সর্বপ্রথম তাঁর শিরস্ত্রাণ হতে আংটা বের করা হয়। এই আংটাটি বের করা দুরূহ বিষয় ছিল। অবশেষে একজন সাহাবী নিজের দাঁত দিয়ে (সেটি) টেনে বের করেন; যার ফলে তার দু'টি দাঁত ভেঙে যায়। এর পর তাঁর (সা.) মুখে পানির ছিঁটা দেওয়া হলে তিনি চেতনা ফিরে পান। অধিকাংশ সাহাবী ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন। কেবল কয়েকজন সাহবীর একটি দল তাঁর (সা.) কাছে ছিলেন। তিনি (সা.) তাদেরকে বলেন, এখন আমাদের পাহাড়ের পাদদেশে চলে যাওয়া উচিত। অতএব, তিনি (সা.) তাদেরকে নিয়ে একটি পাহাড়ের পাদদেশে চলে যান। এরপর বাকি সৈন্যরাও ধীরে ধীরে একত্রিত হতে আরম্ভ করে। কাফের সৈন্যরা যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন আবু সুফিয়ান উচ্চৈঃস্বরে মহানবী (সা.)-এর নাম উচ্চারণ করে এবং বলে আমরা তাঁকে হত্যা করেছি। সাহাবীরা উত্তর দিতে চাইলে তিনি (সা.) তাদেরকে বারণ করে বলেন, এটি (উত্তর দেওয়ার) সময় নয়। আমাদের সঙ্গীরা বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, কিছু নিহত হয়েছে আবার অনেকে আহত হয়েছে। আমরা এখানে অল্প কিছু সংখ্যাক মানুষ আছি এবং (সবাই) ক্লান্ত-শ্রান্ত। (অপরদিকে) কাফেরদের সংখ্যা তিন হাজার এবং তারা সবাই অক্ষত। এমতাবস্থায় উত্তর দেয়া সমীচীন নয়। তারা যদি বলে, তারা আমাকে হত্যা করেছে, তাহলে বলতে দাও। অতএব, তাঁর (সা.) নির্দেশ

অনুযায়ী সাহাবীরা নীরব থাকেন। আবু সুফিয়ান কোনো উত্তর না পেয়ে বলে, আমরা আবু বকরকেও হত্যা করেছি। তিনি (সা.) পুনরায় সাহাবীদেরকে উত্তর দিতে বারণ করেন এবং বলেন নিশ্চুপ থাকো। সে কিছু বলছে, তাকে বলতে দাও। কাজেই, সাহাবীরা তখনও নীরব থাকেন। এবারও যখন আবু সুফিয়ান কোনো উত্তর পায়নি তখন সে বলে, আমরা উমরকেও হত্যা করেছি। হযরত উমর (রা.) অত্যন্ত রাগী স্বভাবের ছিলেন। তিনি উত্তর দিতে চাইলে মহানবী (সা.) তাকেও উত্তর দিতে বারণ করেন। পরবর্তীতে হযরত উমর (রা.) বলেছেন, আমি বলতে যাচ্ছিলাম, তোমরা বলছো যে, আমরা উমরকে হত্যা করেছি, কিন্তু উমর এখনও তোমাদের মাথা ভাঙার জন্য বেঁচে আছে। যাহোক, মহানবী (সা.) তাকেও উত্তর দিতে নিষেধ করেন। আবু সুফিয়ান যখন দেখে যে, কোনো উত্তর আসছে না তখন সে নারা বা জয়ধ্বনি দেয়, **উলু হুবল! উলু হুবল!** অর্থাৎ হুবল প্রতিমা, যেটিকে আবু সুফিয়ান অনেক বড়ো মনে করত, তার মর্যাদা সমুন্নত হোক; হুবলের মর্যাদা উন্নত হোক। অর্থাৎ আমাদের হুবল মুহাম্মদ (সা.) এবং তার সঙ্গীদেরকে হত্যা করেছে। সাহাবীদেরকে যেহেতু মহানবী (সা.) কথা বলতে বা উত্তর দিতে বারণ করেছিলেন তাই তারা এ সময়ও নীরব ছিলেন। কিন্তু খোদার সেই রসূল (সা.)! যিনি নিজের মৃত্যুর গুজব শুনে বলেছিলেন, নিশ্চুপ থাকো, উত্তর দিও না; হযরত আবু বকর (রা.)-র মৃত্যুর খবর শুনেও বলেছিলেন, নীরব থাকো, উত্তর দিও না; হযরত উমর (রা.)-র মৃত্যুর সংবাদ শুনেও বলেছিলেন, চুপ করে থাকো, উত্তর দিও না; বারংবার তিনি (সা.) বলছিলেন, এই মুহূর্তে আমাদের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ অবস্থায় আছে, পুনরায় শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে, তাই নীরবে তাদের কথা শুনতে থাকো, (কিন্তু) যখন সেই পবিত্র মহামানবের কানে **'উলু হুবল, উলু হুবল'** অর্থাৎ 'হুবলের জয় হোক, হুবলের জয় হোক' শব্দ পৌঁছে তখন সাথে সাথে তাঁর (সা.) হৃদয়ে (খোদার) তৌহীদ বা একত্ববাদের আত্মাভিমান জেগে ওঠে। কেননা, এবার মহানবী (সা.)-এর মর্যাদার প্রশ্ন ছিল না; আবু বকর ও উমরের (মর্যাদার) প্রশ্ন ছিল না; বরং আল্লাহ্ তা'লার সম্মান ও মর্যাদার প্রশ্ন ছিল। তিনি (সা.) অত্যন্ত আবেগের সাথে বলেন, এখন তোমরা উত্তর দিচ্ছো না কেন? সাহাবীরা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা কী উত্তর দেবো? তিনি (সা.) বলেন, তোমরা বলো, **'আল্লাহু আয্‌যা ওয়া জাল্লা, আল্লাহু আয্‌যা ওয়া জাল্লা'**; হুবল আবার কে! আল্লাহ্ তা'লার মর্যাদাই সর্বোচ্চ, আল্লাহ্ তা'লার মহিমাই সুমহান।তৌহীদের জন্য তাঁর চেতনা ও প্রেরণার চমৎকার বহিঃপ্রকাশ। তিনি (সা.) তিনবার সাহাবীদেরকে উত্তর প্রদান করতে বারণ করেন যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আশঙ্কার ভয়াবহতা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। তিনি (সা.) জানতেন, ইসলামী সেনাদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে আর খুবই অল্পসংখ্যক সাহাবী তাঁর (সা.) সাথে আছে। বেশিরভাগ সাহাবী আহত ছিলেন আর অন্যরাও ক্লান্ত-শ্রান্ত-অবসন্ন ছিল। শত্রুরা যদি বুঝতে পারে যে, ইসলামী সেনাদলের একটি অংশ এখানে উপস্থিত আছে তাহলে তারা পুনরায় আক্রমণ করার সাহস দেখাতে পারে। কিন্তু এমতাবস্থা সত্ত্বেও যখন খোদা তা'লার সম্মান ও মর্যাদার প্রশ্ন আসে তখন তিনি (সা.) আর নীরব থাকা সহ্য করতে পারেননি। তিনি ভাবেন যে, শত্রুরা জানুক বা না জানুক, তারা আমাদের ওপর আক্রমণ করুক বা আমাদের ধ্বংস করে ফেলুক, এখন আমরা আর নীরব থাকব না। অতএব, তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা নীরব কেন? এই উত্তর দিচ্ছো না কেন যে, **'আল্লাহু আয্‌যা ওয়া জাল্লা'! 'আল্লাহু আয্‌যা ওয়া জাল্লা'।"**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সূরা কওসারের তফসীরে এই পুরো বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। এর বিস্তারিত পড়তে চাইলে তফসীরে কবীর থেকে পাঠ করতে পারেন। জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আরও অনেক বিষয় সেখানে পাওয়া যাবে।

পুনরায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "মক্কার যেসব জ্যেষ্ঠ নেতা মহানবী (সা.)-কে হত্যা করতে চেয়েছিল আজ জগতে তাদের নাম স্মরণ করার কেউ আছে কী? উহুদের প্রান্তরে আবু সুফিয়ান যখন চিৎকার করে বলেছিল, তোমাদের মধ্যে কি মুহাম্মদ (সা.) বেঁচে আছেন? যখন সে কোনো প্রতিউত্তর পায়নি তখন সে বলে, আমরা মুহম্মদ (সা.)-কে হত্যা করেছি! পুনরায় সে চিৎকার করে বলে, তোমাদের মধ্যে কি আবু বকর বেঁচে আছে? যখন এরও কোনো উত্তর এলো না তখন সে বলে, আমরা আবু বকরকেও হত্যা করেছি! আবার সে চিৎকার করে বলে, তোমাদের মধ্যে কি উমর বেঁচে আছে? যখন এরও কোনো প্রত্যুত্তর এলো না তখন সে বলে, আমরা উমরকেও হত্যা করেছি! কিন্তু আজ গিয়ে সেই ধ্বনি উচ্চারণকারী কাফেরদের সর্দার আবু জাহলের সমমনা লোকদের আহ্বান করো আর জিজ্ঞেস করো, তোমাদের মধ্যে কি আবু জাহল বেঁচে আছে? তোমরা দেখতে পাবে মুহাম্মদ (সা.)-এর নামে কোটি কোটি ধ্বনি উচ্চকিত হতে থাকবে এবং সমগ্র জগৎ উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠবে, হ্যাঁ, মুহাম্মদ (সা.) আমাদের মাঝে বিদ্যমান আছেন, কেননা আমরা তাঁর (সা.) প্রতিনিধিত্ব করার সম্মান লাভ করছি। কিন্তু আবু জাহলকে ডাকলে কোনো দিক থেকেই (তোমরা) কোনো আওয়াজ শুনতে পাবে না। আবু জাহলের বংশধর আজও পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকবে, কিন্তু কারো এটি বলার সাহস নেই যে, আমি আবু জাহলের বংশধর। হয়ত উতবা ও শায়বার বংশধররাও আজ পৃথিবীতে রয়েছে, কিন্তু কেউ কি বলে যে, আমি উতবা ও শায়বার বংশধর। সুতরাং মহানবী (সা.)-এর নামকেই আল্লাহ্ তা'লা উন্নীত করেছেন এবং উন্নত রেখেছেন।

এ সম্পর্কে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ননা করেন যে,

নবীদের ওপর যেসব বিপদাবলি নেমে আসে সেগুলোর পেছনে আল্লাহ্ তা'লার শত-সহস্র রহস্য নিহীত থাকে। মহানবী (সা.)-এর ওপর অনেক বিপদাপদ আসত। একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, উহুদের যুদ্ধে তাঁর (সা.) দেহে তরবারির সত্তরটি আঘাত লেগেছিল এবং মুসলমানদের বাহ্যিক অবস্থা শোচনীয় দেখে কাফেররা বেশ আনন্দিত হয়। অতএব এক কাফের এ ধারনার বশবর্তী হয়ে যে, মহানবী (সা.) এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ সাহাবীগণ সবাই শহীদ হয়ে গিয়ে থাকবেন, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলে, মুহাম্মদ (সা.) কি তোমাদের মধ্যে আছেন? মহানবী (সা.) বলেন, নীরব থাকো, এর উত্তর দেবে না। এই নীরবতায় সে আনন্দিত হয় যে, (তিনি) মারা গিয়ে থাকবেন, এ কারণেই উত্তর আসেনি। অতঃপর একইভাবে সে হযরত আবু বকর সম্পর্কেও আওয়াজ দেয়। তখনও এদিকে নীরবতা অবলম্বন করা হয়। এরপরে সে হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে আওয়াজ দেয়। হযরত উমর সহ্য করতে পারেননি। তিনি বলেন, হতভাগা! কী প্রলাপ বকছিস! সবাই জীবিত আছে। এরূপ তিক্ততা দেখাও আবশ্যক হয়ে থাকে, কিন্তু এর ফলাফল এই হয় যে, রসূলে করীম (সা.) বলেন, এখন কাফেররা আমাদের ওপর আর আক্রমণ করতে পারবে না। এটি সম্ভবত তিনি বলেছিলেন খন্দকের যুদ্ধের পর, উহুদের যুদ্ধের পর খন্দকের যুদ্ধ হয়েছে। এটি যেহেতু মলফুযাতের উদ্ধৃতি, হতে পারে লেখক সঠিকভাবে উল্লেখ করতে পারেননি। খন্দকের যুদ্ধের পর তিনি (সা.) এ উক্তি করেছিলেন যে, এরপর কাফেররা আর আমাদের ওপর চড়াও হতে পারবে না, বরং আমরা কাফেরদের ওপর আক্রমণ করব। মক্কা থেকে বের হওয়ার সময়

মহানবী (সা.)-এর জন্য কীরূপ কষ্টদায়ক অবস্থা ছিল! কিন্তু এখন আল্লাহ্ তা'লা অবস্থা পাল্টে দিয়েছেন।

হযরত হানযালার শাহাদতের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ যুদ্ধেই আরেকজন সাহাবীর আত্মত্যাগ ও বীরত্ব এবং মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসায় স্বীয় প্রাণ বিসর্জন দেয়ার ঘটনা পাওয়া যায়। ইনি সেই সাহাবী ছিলেন যার স্ত্রী বলেন, আমার স্বামী যখন জানতে পারেন যে, মহানবী (সা.) যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হয়ে গেছেন তখন আমার স্বামীর জন্য সহবাস সংক্রান্ত গোসল আবশ্যক ছিল। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর যাওয়ার সংবাদ শুনে এত দ্রুত এবং ব্যকুলচিত্তে তিনি ঘর থেকে বের হয়েছেন যে, গোসল করাও জরুরী মনে করেননি আর তরবারি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। যুদ্ধ চলাকালে তিনি একবার কাফেরদের সেনাপতি আবু সুফিয়ানের সামনে পৌঁছে যান। আবু সুফিয়ান ঘোড়ার ওপর ছিল, হযরত হানযালা তার ঘোড়াকে আঘাত করে আহত করে দেন, যার ফলে ঘোড়াটি আবু সুফিয়ানকে নীচে ফেলে দেয়। আবু সুফিয়ান নীচে পড়তেই চিৎকার করতে থাকে। এদিকে হযরত হানযালা দ্রুত তরবারি উঁচিয়ে আবু সুফিয়ানকে জবাই করতে উদ্যত হন। কিন্তু তখনই শাদ্দাদ বিন অওসের দৃষ্টি তার ওপর পড়ে। একটি বর্ণনা অনুযায়ী তার প্রকৃত নাম শাদ্দাদ বিন আসওয়াদ। যাহোক, শাদ্দাদ হযরত হানযালাকে আবু সুফিয়ানের ওপর তরবারি উত্তোলন করতে দেখে দ্রুত হযরত হানযালার ওপর তরবারি দ্বারা আক্রমণ করে তাকে শহীদ করে। মহানবী (সা.) হযরত হানযালার মৃত্যুতে বলেন, তোমাদের সাথী অর্থাৎ হানযালাকে ফেরেশতারা গোসল দিচ্ছে। একটি রেওয়ায়েতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি ফেরেশতাদের দেখছি, তারা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যখানে রুপার পাত্রে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ পানিতে হযরত হানযালাকে গোসল করাচ্ছে। হযরত হানযালার স্ত্রীর নাম ছিল জামিলা এবং তিনি মুনাফেক সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের মেয়ে এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের বোন ছিলেন। হযরত জামিলা বলেন, তিনি অর্থাৎ হযরত হানযালা অপরিচ্ছন্ন অবস্থাতেই রণক্ষেত্রে চলে এসেছিলেন। অর্থাৎ তার জন্য গোসল করা আবশ্যক ছিল। মহানবী (সা.) হযরত জামিলার এই কথা শুনে বলেন, এ কারণেই ফেরেশতারা তাকে গোসল করাচ্ছিল। হযরত হানযালার সাথে হযরত জামিলার বিয়ের এটিই প্রথম রাত ছিল, যার প্রভাতে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত জামিলা বর্ণনা করেন, হানযালা যখন শত্রুর সাথে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার ঘোষণা শুনতে পান, তখন তাৎক্ষণিকভাবে গোসল না করেই রওয়ানা হয়ে যান। সেই রাতেই হযরত জামিলা স্বপ্নে দেখেন যে, হঠাৎ আকাশে একটি দরজা খুলে যায় আর তার স্বামী হযরত হানযালা সেই দরজায় প্রবেশ করেন। এর পরপরই সেই দরজাটি বন্ধ হয়ে যায়। এক রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, হযরত জামিলা নিজ গোত্রের চার নারীকে একথার সাক্ষী বানিয়েছিলেন যে, হানযালা আমার সাথে রাত্রিযাপন করেছেন। এটা তাকে এই কারণে করতে হয়েছে যেন তার (সম্ভাব্য) গর্ভধারণের বিষয়ে মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি না হয়। মানুষ সন্দেহ ও কুধারণার জন্ম দিয়ে থাকে, কথাও রটিয়ে থাকে। বর্তমান যুগেও এমন মানুষ আছে যারা (অন্যদেরকে) অপবাদ দিয়ে বেড়ায়। হযরত জামিলা এই (সম্ভাব্য) সন্দেহকে দূর করার জন্য নিজেই সাক্ষী রাখেন। হযরত জামিলা স্বয়ং বলেন যে, আমার এমনটি করার কারণ হলো আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, আকাশে একটি দরজা খুলে যায় যাতে তিনি প্রবেশ করেন আর দরজাটি বন্ধ হয়ে যায়। অতএব আমি বুঝতে পারি যে, হানযালার সময় চলে এসেছে আর সেই রাতে আমি তার মাধ্যমে গর্ভবতী হয়ে গিয়েছিলাম।

এই গর্ভধারণে আব্দুল্লাহ্ বিন হানযালা জন্মগ্রহণ করেন। কুরাইশরা হযরত হানযালাকে হত্যার পর তার লাশকে বিকৃত করেনি। অর্থাৎ তার কান, নাক আর চোখ কেটে ফেলেনি, কেননা তার পিতা আবু আমের রাহেব কুরাইশদের সাথে ছিল।

হযরত সাদ বিন রবি'-এর শাহাদাতের ঘটনাও রয়েছে। হযরত সাদ বিন রবি' বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং উহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। উহুদের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) বলেন, কে আমার কাছে সাদ বিন রবি'র সংবাদ নিয়ে আসবে? এক ব্যক্তি নিবেদন করে, আমি। অতএব সে নিহতদের মাঝে গিয়ে সন্ধান করতে থাকে। হযরত সাদ সেই ব্যক্তিকে দেখে বলেন, তোমার কী অবস্থা? সে বলে, মহানবী (সা.) আমাকে পাঠিয়েছেন যেন আমি তাঁর (সা.) কাছে তোমার সংবাদ নিয়ে যাই। তখন হযরত সাদ বলেন, মহানবী (সা.)-এর সমীপে আমার সালাম পৌঁছাবেন আর তাঁকে (সা.) এই সংবাদ দেবেন যে, আমার দেহে বর্ষার ১২টি আঘাত লেগেছে আর আমার সাথে যারা লড়াই করেছে তারা জাহান্নামে পৌঁছে গিয়েছে। অর্থাৎ আমার সাথে যে-ই লড়াই করতে এসেছে আমি তাকে হত্যা করেছি। আর আমার গোত্রকে এই সংবাদ দেবেন যে, তোমাদের মধ্য থেকে কোনো এক ব্যক্তিও যদি জীবিত থাকে আর আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) শহীদ হয়ে যান, তাহলে তোমাদের কোনো অজুহাত আল্লাহ্ তা'লার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। বর্ণিত আছে যে, যেই ব্যক্তি তার কাছে গিয়েছিল তিনি ছিলেন হযরত উবাই বিন কাব (রা.)। হযরত সাদ, হযরত উবাই বিন কাব-কে বলেন, নিজ জাতিকে বলো যে, তোমাদেরকে সাদ বিন রবী বলেছেন, আল্লাহ্‌কে ভয় করো। এছাড়া আরও একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, যেই অঙ্গীকার তোমরা আকাবার রাতে মহানবী (সা.)-এর সাথে করেছিলে সেটিকে স্মরণ করো। আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ্‌র সমীপে তোমাদের কোনো অজুহাতই গ্রহণযোগ্য হবে না যদি কাফেররা তোমাদের নবী (সা.) পর্যন্ত পৌঁছে যায় আর তোমাদের মধ্য থেকে কোনো একজনেরও চোখ কর্মক্ষম থাকে, অর্থাৎ কোনো একজনও যদি জীবিত অবশিষ্ট থাকে। অর্থাৎ তোমারা নিজেদের প্রাণ আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আর তাঁর ধর্মের জন্য উৎসর্গ করবে। অতএব এই ছিল সাহাবীদের উদ্দীপনা যে, মৃত্যুর সময়ও (তাদের) কেবল এই চিন্তা ছিল যে, আমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তা বিধান করতে হবে। হযরত উবাই বিন কাব বর্ণনা করেন, আমি তখনও সেখানেই ছিলাম, অর্থাৎ হযরত সাদের পাশেই ছিলাম যখন হযরত সাদ বিন রবি' মৃত্যু বরণ করেন। সেই সময় তিনি আঘাতে জর্জরিত ছিলেন। আমি মহানবী (সা.)-এর নিকট ফিরে এসে তাঁকে সবকিছু বলে দিলাম যে, এই এই কথা হয়েছিল, তাঁর অবস্থা এই এবং এভাবে শহীদ হয়েছেন। এ কথা শুনে তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি কৃপা করুন। সে জীবিত এবং মৃত উভয় অবস্থায় আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল। হযরত সা'দ বিন রবি এবং হযরত খারজা বিন যায়েদকে একই কবরে দাফন করা হয়।

এই ঘটনাটি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব হযরত সা'দ (রা.)-র শাহাদতের বর্ণনা দিতে গিয়ে এভাবে বলেন যে,

মহানবী (সা.) নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে শহীদদের লাশসমূহ পর্যবেক্ষণ করছিলেন। সেসময় অর্থাৎ যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যায় তখন যে দৃশ্য মুসলমানদের সামনে ছিল তা রক্তাশ্রু ঝরানোর মতো ছিল। মহানবী (সা.) নিজেও ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু তারপরও তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে চলে আসেন, শহীদদের লাশের দেখাশোনা আরম্ভ হয়। তিনি (রা.) বলেন, ৭০ জন মুসলমান রক্ত ও ধুলোমাখা অবস্থায় মাটিতে লুটানো ছিল এবং আরবের বর্বর প্রথা তথা অঙ্গকর্তনের ভয়াবহ দৃশ্য তুলে ধরছিল। তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছিল,

তাদের মুখাবয়ব বিকৃত করা হয়েছিল। এসব মৃত ব্যক্তিদের মাত্র ৬ জন মুহাজের ছিল আর বাকি সবাই আনসারী ছিল। কুরাইশদের মৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল ২৩। মহানবী (সা.) যখন আপন চাচা ও দুধভাই হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিবের লাশের নিকট পৌঁছেন তখন তাঁর নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার উপক্রম হয়, কেননা অত্যাচারী হিন্দা, যে কিনা আবু সুফিয়ানের স্ত্রী ছিল, তার লাশকে সে নির্মমভাবে বিকৃত করেছিল। তিনি (সা.) কিছুক্ষণ পর্যন্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তাঁর চেহারায় দুঃখ ও ক্ষোভের ছাপ প্রকাশ পাচ্ছিল। ক্ষণিকের জন্য তাঁর (সা.) মাথায় এ চিন্তাও আসে যে, মক্কার এসব বন্য প্রাণিদের সাথে যতক্ষণ না তাদের মতো আচরণ করা হবে ততক্ষণ তারা সংবিৎ ফিরে পাবে না, তাদের শিক্ষা হবে না। কিন্তু তিনি (সা.) এ চিন্তা থেকে সরে আসেন এবং ধৈর্যধারণ করেন বরং এরপর তিনি (সা.) অঙ্গকর্তনের যে কুপ্রথা ছিল, মুখাবয়ব বিকৃত করার যে বাজে প্রথা ছিল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে ফেলার যে প্রথা ছিল, তা ইসলামে চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন আর বলেন, শত্রুরা যা খুশি করুক কিন্তু তোমরা এ বর্বর পন্থা থেকে যে কোনো পরিস্থিতিতে বিরত থাকবে এবং পুণ্য ও অনুগ্রহের পন্থা অবলম্বন করবে। এরপর তিনি (রা.) লেখেন,

কুরাইশরা অন্যান্য সাহাবীদের লাশের সাথেও একই আচরণ করেছিল। যেমন মহানবী (সা.)-এর ফুফাতো ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশের লাশকেও কুৎসিতরূপে বিকৃত করা হয়েছে। মহানবী (সা.) যখনই একটি লাশের পর অপর লাশের দিকে যেতেন তাঁর চেহারায় ততই দুঃখ-বেদনার ছাপ প্রকট রূপ ধারণ করত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এসব শহীদ ও তাঁদের কুরবানীসমূহের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মহানবী (সা.)-এর প্রতি আনসারদের সর্দার সা'দ বিন রবি' আনসারীর প্রেম-ভালোবাসার বর্ণনা এভাবে দেন যে,

উহুদের যুদ্ধের একটি ঘটনা হলো, যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) হযরত উবাই বিন কাবকে বলেন, যাও গিয়ে আহতদের খবরাখবর নাও। তিনি দেখতে দেখতে হযরত সা'দ বিন রবি'র পাশে পৌঁছেন যিনি মারাত্মক আহত ছিলেন এবং মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে ছিলেন। তিনি তাকে বলেন, নিজের আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠদের উদ্দেশ্যে যদি কোনো বার্তা পাঠাতে চান তবে আমাকে বলুন। হযরত সা'দ মুচকি হেঁসে বলেন, আমি এ অপেক্ষাতেই ছিলাম যে, যদি কোনো মুসলমান আসে তার মাধ্যমে আমি বার্তা পাঠাবো। তুমি আমার হাতে হাত রেখে ওয়াদা করো যে, আমার বার্তা অবশ্যই পৌঁছে দেবে। সে মুহূর্তেও এতটা জ্ঞান ছিল যে, তিনি বলেন, আমার হাতে হাত দাও। এটি দৃঢ় অঙ্গীকার নেয়ার একটি রীতি, একটি বহিঃপ্রকাশ যে, আমার বার্তা অবশ্যই পৌঁছে দেবে। অতঃপর তিনি যে বার্তা প্রদান করেন তা হলো, হে আমার ভাই! মুসলমানদেরকে আমার সালাম পৌঁছাবে। আর আমার জাতি এবং আমার আত্মীয়-স্বজনদের বলবে যে, মহানবী (সা.) আমাদের কাছে খোদা তা'লার সর্বোত্তম আমানত। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে এই আমানতের সুরক্ষা করে এসেছি। এখন আমরা বিদায় নিচ্ছি আর এই আমানতের সুরক্ষার দায়িত্ব তোমাদের হাতে ন্যস্ত করছি। এমন যেন না হয় যে, তোমরা এর সুরক্ষার ব্যাপারে দুর্বলতা প্রদর্শন করবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, দেখো! মানুষ যখন অনুভব করে, আমি মৃত্যু পথযাত্রী, এমন সময় নানান চিন্তাভাবনা তার হৃদয়ে উদিত হয়। সে চিন্তা করে, আমার স্ত্রীর কী অবস্থা হবে, আমার সন্তানদের কে খোঁজ-খবর রাখবে, কিন্তু এই সাহবী এমন কোনো বার্তা দেননি। কেবল এ কথাই বলেন যে, আমরা মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষার প্রচেষ্টায় এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি, তোমরাও আমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো। তাদের মাঝে এমনই ঈমানী শক্তি ছিল

যার বলে বলীয়ান হয়ে তারা বিশ্ব ব্যবস্থা পাল্টে দিয়েছেন এবং রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়েছেন। রোমান সম্রাট বিস্মিত ছিল যে, এরা কারা! ইরানের সম্রাট তার সেনাপতিকে লেখে যে, যদি তোমরা এই আরবদেরকেই পরাজিত করতে না পারো তবে ফিরে এসে ঘরে চুড়ি পড়ে বসে থাকো। অর্থাৎ নারীদের মতো ঘরে বসে থাকো। লড়াই করতে কেন যাও? সে অর্থাৎ বাদশাহ্ তার সেনপতিকে বলে যে, এরা গুইসাপ ভক্ষণকারী জাতি, এমন লোকদেরও তোমরা থামাতে পারছো না? এরা তো তুচ্ছ-নিকৃষ্ট খাদ্য ভক্ষণকারী। সেনাপতি উত্তর দেয়, এদেরকে তো মানুষই মনে হয় না, এরা যেন কোনো দানব। এরা তরবারি ও বর্শা মাড়িয়ে সামনে অগ্রসর হয়।

এই ঘটনাকে আরেক আঙ্গিকে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে বর্ণনা করেন যে,

উহুদের যুদ্ধ শেষ হলে মহানবী (সা.) একজন সাহাবীকে আহতদের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি এক আনসার সাহাবীকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখতে পান। তিনি তার নিকটে গিয়ে বলেন, ভাই! তোমার কোনো বার্তা থাকলে আমাকে বলো। আমি তোমার প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজনদের কাছে সেই বার্তা পৌঁছে দেবো। তিনি বলেন, আমি অপেক্ষায় ছিলাম যে, কোনো মদিনাবাসীর সাথে আমার সাক্ষাৎ হবে আর আমি তার মাধ্যমে নিজ নিকটাত্মীয়দের কাছে একটি বার্তা প্রেরণ করব। তোমার সাথে সাক্ষাৎ হয়ে খুবই ভালো হলো। আসো! আমার হাতে তোমার হাত রাখো এবং প্রতিজ্ঞা করো যে, আমার বার্তা আমার পরিবার-পরিজনের কাছে পৌঁছে দেবে। তিনি তার হাতে হাত রেখে অঙ্গীকার করেন, আমি আপনার বার্তা অবশ্যই পৌঁছাবো। অতঃপর সেই আহত সাহাবী বলেন, আমার প্রিয়জন, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের গিয়ে বলবে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমাদের জাতির অমূল্য সম্পদ এবং এটি একটি জাতীয় আমানত যা আমাদের কাছে রয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই অমূল্য রত্নের যথার্থ মর্যাদা ও মূল্যের চেতনা তোমাদের অন্তরেও বিরাজমান থাকবে। তা সত্ত্বেও এই বার্তা তোমাদের নিকট পৌঁছানো আমি আমার কর্তব্য মনে করি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জীবিত ছিলাম এই আমানতের রক্ষণাবেক্ষণে ত্রুটি করিনি এবং এর সুরক্ষায় নিজেদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছি। এখন আমরা মৃত্যু পথযাত্রী এবং আমাদের অর্বতমানে এই আমানত রেখে যাচ্ছি। আমি আমার সকল ছেলে, ভাই এবং তাদের সন্তানদের কাছে এই আশা রাখি যে, তারা তাদের প্রাণের চেয়ে বেশি এই পবিত্র আমানতের সুরক্ষা করবে এবং এ ব্যাপারে কোনোরূপ ত্রুটি করবে না।

তিনি (রা.) আরেক স্থানে এই ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, একজন আনসার নেতা আহত অবস্থায় পড়ে ছিলেন। তার অবস্থা এতটাই সঙ্গীন ছিল যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার উপক্রম ছিল। একজন সাহাবী খুঁজতে খুঁজতে তার কাছে পৌঁছে তার খবরাখবর জানতে চাইলেন আর বললেন, কোনো সংবাদ স্ত্রী-সন্তান এবং আত্মীয়স্বজনকে দেয়ার থাকলে দিতে পারেন। তিনি বললেন হ্যাঁ, আমি এই অপেক্ষায়ই ছিলাম যে, কোনো মুসলমানকে পেলে তার মাধ্যমে সংবাদ পৌঁছাব। তিনি (রা.) বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি জানে যে, মৃত্যুর সময় ঘরেও কত কষ্ট হয়। মানুষের মৃত্যুর সময় সেটি ঘরেই হোক না কেন অত্যন্ত কষ্টদায়ক সময় হয়ে থাকে। মুমূর্ষু ব্যক্তির এটি ইচ্ছা হয়ে থাকে যে, কিছুক্ষণ আরও পেলে স্ত্রী-সন্তান এবং ভাইবোনদের সাথে আরও কিছু কথা বলবে এবং তাদের জন্য কোনো ওসীয়্যত করে যাবে, কিন্তু সেই সাহাবী স্ত্রী সন্তানদের কাছে ছিলেন না, ঘরেও ছিলেন না আর কোনো হাসপাতালের নরম বিছানার ওপর শুয়েও ছিলেন না। বরং পাথুরে ভূমিতে পড়ে ছিলেন, কিন্তু এমন অবস্থাতেও তিনি এই সংবাদ দেননি যে, আমার

স্ত্রীকে সালাম দিও আর তাকে বলো যে, সন্তানদের সঠিকভাবে যেন প্রতিপালন করে অথবা আমার সম্পত্তি এভাবে বণ্টন কোরো অথবা অমুক অমুক জায়গায় আমার সম্পদ রয়েছে তা যেন নিয়ে নেয় (তিনি একজন সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন)। বরং যখন বলেছেন তো এটি বলেছেন যে, আমার সন্তান এবং ভাইদের আমার পক্ষ থেকে এই সংবাদ দিও যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) তোমাদের কাছে খোদা তা'লার প্রতি মূল্যবান আমানতস্বরূপ। আমার মধ্যে যতক্ষণ প্রাণ ছিল আমি সেটিকে উৎসর্গ করে এই আমানতের সুরক্ষা করেছি আর এখন আমার প্রিয় ভাইদের এবং সন্তানদের প্রতি আমার শেষ সময়ের ওসীয়্যত হলো, তারাও যেন নিজ প্রাণের বিনিময়ে এই আমানতের সুরক্ষা করে। আর এটি বলে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এমন এমন রসূলপ্রেমের উল্লেখ রয়েছে যে, মানুষ হতবাক হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মাঝেও রসূলপ্রেমের এমন উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করুন এবং যখনই চিন্তা সৃষ্টি হবে তখন আমরা আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এগিয়ে যাব আর আমাদের দুর্বলতাসমূহকে দূর করার ক্ষেত্রেও প্রকৃত চেষ্টা করব যেন আমরা সঠিক ইসলামিক পদ্ধতি নিজেদের ইবাদতে নিজেদের চরিত্রে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করি। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন।

আমি কয়েকটি জানাযার নামায পড়াবো। মরহুমদের স্মৃতিচারণ রয়েছে।

প্রথম স্মৃতিচারণ ইয়েমেনের ডাক্তার মনসুর শবূতি সাহেবের। মনসুর শবূতি সাহেব ইয়েমেনে কারাবন্দি ছিলেন, আহমদীয়াতের জন্য তাকে পাকড়াও করা হয়েছিল। সেখানে বন্দি থাকা অবস্থাতেই ২৬ জানুয়ারি ৬৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

আহমদীয়াতের কারণে তিনি কারাবন্দি ছিলেন, অসুস্থ ছিলেন এবং সঠিক চিকিৎসাও হয়নি। তার সাথে খারাপ আচরণ হয়ে থাকবে হয়ত। যাহোক, যে বর্ণনাই রয়েছে সেটি কম হোক অথবা বেশি, তার সেখানে মৃত্যু হয়েছে এবং বন্দি অবস্থায় হয়েছে, এজন্য এটি শাহাদত হবে আর তিনি ইয়েমেনের প্রথম আহমদী শহীদ। মরহুম নিজের বৃদ্ধা মা এবং স্ত্রী ছাড়া দুই ছেলে আয়মান ও বেলালকে রেখে গেছেন। মরহুমের ভাই নাসের শবূতি সাহেব, যিনি এখানে লন্ডনে থাকেন, তিনি বলেন, তার মৃত্যুর সংবাদ পহেলা ফেব্রুয়ারি তারিখে তার সন্তানের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সব আহমদীই যেহেতু বন্দি অবস্থায় রয়েছে, প্রায় সব আহমদীকেই ধরা হয়েছে, তাই মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়িয়েছে ও দাফন করেছে অ-আহমদীরা। এরপর নাসের সাহেব বলেন, তার দাদা আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ওসমান শবূতি ইয়েমেনের প্রথম আহমদী ছিলেন এবং ডাক্তার মনসূর শবূতি-র পিতা মাহমুদ আব্দুল্লাহ্ শবূতি ইয়েমেনের প্রথম শাহেদ মুরব্বী ছিলেন। মরহুমের মাতা হলেন শাহরুখ নাসরিন সাহেবা, যিনি রাবওয়ানিবাসী সৈয়দ বশীর আহমদ শাহ সাহেব এবং ফররুখ খানম সাহেবার কন্যা। ফররুখ খানম সাহেবা জুনুদ বংশের। তিনি নিজ মাতা হালিমা বানু এবং ভাই সৈয়দ হাজী জুনুদুল্লাহ্ সাহেবের সাথে মহানবী (সা.)-এর এই নির্দেশের ওপর আমল করার তৌফিক লাভ করেন যে, যখন ইমাম মাহদী আসবেন তখন তাঁর হাতে বয়আত করবে যদিওবা বরফের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয়। অতএব তারা কাশগড় থেকে বরফের পাহাড় পাড়ি দিয়ে কাদিয়ান আসেন আর বয়আত করেন। মনসূর শবূতি সাহেবের মাতা এই

পরিবারের সদস্যা ছিলেন। অর্থাৎ তার নানী তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে এসেছেন।

শাহাদতের ঘটনা সম্পর্কে তার পুত্র বেলাল শবূতি সাহেব লিখেছেন যে, নিরাপত্তা বিভাগের লোকেরা জোরপূর্বক আমাদের ঘরে প্রবেশ করে। আমার পিতাকে ধাক্কা দেয়, তার বুকে বন্দুক ধরে। এরপর আমাকে ও আমার পিতাকে ধরে নিয়ে যেতে উদ্যত হলে আমার পিতা বলেন, আমাকে হত্যা করে ফেলো কিন্তু আমার পুত্রকে নিয়ে যেও না। যখন অ-আহমদীরা জানাযা পড়ে সেখানে তার পুত্র একমাত্র আহমদী ছিল, যার বয়স ১৬ বছর, যিনি জানাযায় অংশ নিতে পেরেছেন। অন্য কোনো আহমদী পুরুষ সেখানে ছিল না। তিনি বলেন, তারা বাবার কাছ থেকে টাকাপয়সা কেড়ে নেয়ার পর তারা বলে, তোমাকে বাহির থেকে কেউ টাকা পাঠায়। বাবা বলেন, আমাকে কেউ অর্থ পাঠায় না, (এগুলো) আমার নিজের পরিশ্রমের উপার্জন।

এই ভুল ধারণা সর্বত্র আহমদীদের সম্পর্কে নামসর্বস্ব আলেমরা সৃষ্টি করে রেখেছে যে, নাঊযুবিল্লাহ্ আমরা বিভিন্ন পশ্চিমা শক্তির কাছ থেকে অর্থ নিয়ে খাই আর তাদের ইসলামের বিরুদ্ধে আমাদের এজেন্ডা রয়েছে। অথচ প্রত্যেক আহমদী তো স্বয়ং আর্থিক কুরবানী করে ইসলামের বার্তা পৃথিবীতে প্রচার করছে আর মানবতার সেবা করছে। যাহোক এ সংক্রান্ত বাকি বিবরণ বেশ দীর্ঘ।

এরপর আমি তার স্ত্রীর বর্ণনা তুলে ধরছি। আমার কাছে যে বার্তা তিনি প্রেরণ করেছেন তাতে তিনি লিখেন যে, যারা গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়েছিল তারা আমাকে সেই স্থান দেখিয়েছে যেখানে আমার স্বামীকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। তারা আমাকে বলে যে, আমার স্বামী নিজ কক্ষে অধিকাংশ সময় নামায ও নফল ইবাদতে ক্রন্দনরত থাকতেন। তারা আরও বলে যে, ডাক্তার সাহেবকে বন্দি করার কারণ হলো কতক আহমদী এই সংবাদ দিয়েছিল যে, ডাক্তার সাহেবের কাছে যুক্তরাজ্য থেকে অর্থ আসে যা তিনি ইয়েমেন-এ মিলিশিয়া বাহিনী প্রস্তুতের জন্য ব্যয় করেন। (এগুলো অযথাই মিথ্যা অপবাদ।) কিন্তু তদন্তে এই কথা মিথ্যা সাব্যস্ত হয়। আমরা তাকে মুক্ত করতেই যাচ্ছিলাম এমন সময় দুশ্চিন্তায় তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে।

যাহোক এটি হলো তাদের বিবৃতি যা তারা মরহুমের স্ত্রীকে বলেছিল। হতে পারে যে, উচ্চ পদস্থ লোকদের মনোভাব ভিন্ন আর নিম্ন পদস্থরা আরও বেশি যথেচ্ছাচারে অভ্যস্ত হয়ে থাকবে। হয়ত তাদের কঠোরতার কারণেই তার স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব পড়েছে। মরহুমের ভাই নাসের শবূতি সাহেব তার জীবনচরিত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, আমাদের ভাই মনসূর শবূতি অত্যন্ত দয়ালু ও পরোপকারী ভাই ছিলেন। পড়াশোনায় অত্যন্ত মেধাবী, পুরো দেশের প্রথম দশজন ছাত্রের একজন ছিলেন, যাদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে পুরস্কৃতও করা হয়েছিল। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত ছিলেন। ফজরের নামাযের পর রীতিমতো কুরআন পাঠ করতেন। চাঁদা আদায়ে খুবই নিয়মিত ছিলেন। আত্মীয়স্বজনের পূর্বে অন্যদের চিকিৎসা দিতেন আর সাহায্য করতেন। রোগীদের সাথে সর্বদা হাসিমুখে কথা বলতেন। দরিদ্র রোগীদের কাছ থেকে কোনো অর্থ নিতেন না। (তাদেরকে) ঔষধও দিয়ে দিতেন আর কাউকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হলে সেক্ষেত্রেও তাকে সাহায্য করতেন। দরিদ্রদের অপারেশন করতে হলে নিজ বেতন থেকে অপারেশনের ফিস ছেড়ে দিতেন। তিনি আরও বলেন, আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্য থেকে যখনই কেউ অসুস্থ হতো তখন (আমাদের) এই ভাইয়ের কাছে চিকিৎসার জন্য আসতো। আর তিনি যখন অন্য শহর সানআ-তে চলে যান,

তখন প্রতিবেশীরা খুবই বিমর্ষ হয়। পিতামাতার সাথে অনেক উত্তম আচরণ করতেন। তাদেরকে হজ্জও করিয়েছেন।

ডাক্তার সাহেবের মাতা শাহরুখ নাসরীন সাহেবা বলেন যে, আমি যখন গর্ভবতী ছিলাম তখন আমি স্বপ্নে দেখি যে, রাবওয়ার একজন পুণ্যবতী মহিলা, যার নাম ছিল যয়নব, আমার মাতাকে কোলে তুলে বলেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আসছেন। আমি তাঁর (আ.) সন্ধানে এদিক সেদিক তাকালে কাউকে দেখতে পাইনি। এরপর আমার ঘুম ভেঙে যায়। ডাক্তার সাহেবের শৈশব থেকেই তবলীগের আগ্রহ ছিল। স্কুলে ইসলামিয়াতের শিক্ষককে আহমদীয়াতের তবলীগ করতেন। আর শিক্ষকও বিরোধিতা না করে তার কথা শুনতেন।

মরহুমের এক পুত্র আয়মান শবূতি সাহেব জার্মানীতে আছেন। তিনি বলেন, আমার মরহুম পিতা কখনো আমাকে বকাঝকাও করেননি আর প্রহারও করেননি। শুধু একবার প্রহার করার কথা স্মরণ আছে, তখন আমার বয়স ছিল ১৩ বছর আর আমি বাজামা'ত নামায পড়তে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলাম। এর ফলে আমাকে সামান্য প্রহার করেছেন, এছাড়া আর কখনো নয়। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে সর্বদা বিপদের সময় দোয়া করার নসীহত করতেন। নিজেও এর ওপর আমল করতেন। আমি তাকে সেজদায় কাঁদতে দেখেছি। যখন আমি স্কুলে পড়তাম তখন আমাদেরকে ফজরের নামাযের সময় জাগাতেন। বাজামা'ত নামায আদায় করতেন, এরপর তিলাওয়াত করতেন। তিনি জর্দান থেকে সার্জারীতে পিএইচডি করেছেন আর সেখানে পাঁচ বছর অবস্থান করেন। তিনি বলেন, আমিও সেখানে তার কাছে যাই। সেখানে যে যায়গায় জুমুআ হতো তা এক ঘন্টার দূরত্বে ছিল। প্রতি জুমুআয় গাড়ি চালিয়ে সেখানে যেতেন। অধ্যয়নের একান্ত আগ্রহ ছিল। ব্যপক হারে জামা'তের বইপুস্তক পাঠ করতেন। জর্দান থেকে যখন ফিরে আসেন তখন তার ব্যাগগুলো বেশ ভারী ছিল। আমি ভেবেছিলাম অনেক উপহার সামগ্রী নিয়ে এসে থাকবেন। শিশুদের শখ থাকে যে, পিতামাতা উপহার নিয়ে আসবে। কিন্তু তার ব্যাগে উপহার ছিল না, বরং তফসীরে কবীরের আরবী অনুবাদ এবং আরও কিছু জামা'তী পুস্তক ছিল।

আত্মীয়রা অ-আহমদী হলেও তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতেন। তিনি বলেন, আমাকেও এবং আমার মাতাকেও সাথে নিয়ে যেতেন। আমি যখন তাকে জিজ্ঞেস করতাম যে, অ-আহমদী আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাৎ করা কেন এত জরুরী? তখন তিনি বলতেন, মহানবী (সা.) আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন। যদি রক্তসম্পর্কের আত্মীয়দের সাথেই সম্পর্ক না রাখি তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অসন্তুষ্ট হবেন।

মারওয়া শবূতি সাহেবা বলেন, (মরহুম) অত্যন্ত সম্মানীত, চরিত্রবান, পুণ্যবান, সদা হাস্যোজ্জ্বল, স্নেহশীল, সাহায্যকারী, ভদ্র, দানশীল, দয়া ও কৃপাবান এবং খুবই মেধাবী ছিলেন। সর্বদা পড়াশোনায় অগ্রগামী ছিলেন এবং পুরো ইয়েমেনে প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন। মানবসেবা ও আহমদীয়াতের সেবায় অগ্রগামী ছিলেন। আহমদী ও অ-আহমদী সবার মাঝে প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সবাই এমনকি অ-আহমদীরাও তার মৃত্যুতে খুবই মর্মাহত।

অ-আহমদীরাও তাঁর মৃত্যুতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। ইয়েমেনের ডাক্তারদের ইউনিয়ন এই বিবৃতি দিয়েছে যে, অত্যন্ত দুঃখ ও আক্ষেপের সাথে এই সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, জেনারেল সার্জারী কনসালটেন্ট ডাক্তার মনসূর শবূতি অমুক দিন ইহধাম ত্যাগ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। এরপর তাদের অর্থাৎ মেডিকেল কাউন্সিলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে

যে, তার রহস্যজনক মৃত্যুতে চিকিৎসক মহলে গভীর উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ বিরাজমান। আজ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ডাক্তার মনসূর-এর স্বাস্থ্য খুবই ভালো ছিল। তাকে গ্রেপ্তার করার কারণও বলা হয়নি আর দুই সপ্তাহ পর্যন্ত এটিও জানা যায়নি যে, তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মৃত্যুর মাত্র এক দুই দিন পূর্বে তাকে একান্ত ভগ্ন স্বাস্থ্যে জনসমক্ষে সামনে আনা হয়।

তার কতক অ-আহমদী বন্ধুও সোশাল মিডিয়ায় তার সম্পর্কে লিখেছেন। একজন অ-আহমদী ডাক্তার খালেদ আদীব সাহেব বলেন, আমি প্রথমবার সানআ হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কাজ করতে গেলে সেখানে অনেক ডাক্তারকে একজন যুবক ডাক্তারের আশেপাশে দাঁড়ানো দেখতে পাই। আমি জিজ্ঞেস করলে একজন সঙ্গী বলেন যে, ইনি হলেন ডাক্তার মনসূর শবূতি, যিনি জেনারেল সার্জারী কনসালটেন্ট আর সর্বাপেক্ষা বেশি পরিশ্রমী ও সদা সোচ্চার ও সহযোগিতাকারী একজন ডাক্তার। সকল ডাক্তার ও ছাত্ররা তার সাথে ডিউটি দেয়া পছন্দ করে। কেননা তিনি সর্বদা সবাইকে বেশি বেশি শেখানোর ও বুঝানোর চেষ্টা করতেন। তার মাঝে অর্থকড়ি, পদ কিংবা খ্যাতির কোনো লোভ ছিল না। মরহুম অত্যন্ত শান্তশিষ্ট প্রকৃতি সম্পন্ন, সোচ্চার, স্বাস্থ্যসচেতন, সদা হাস্যোজ্জ্বল এবং অত্যন্ত উচ্চ মানের চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সকল ধরনের আমিত্ব ও জগতপ্রেম থেকে সহস্র ক্রোশ দূরে ছিলেন।

এক বন্ধু লিখেছেন, তার মৃত্যু ইয়েমেনের জন্য অনেক বড়ো একটি ক্ষতি। ইয়েমেন এমন একজন পুণ্যবান মানুষকে হারিয়েছে যিনি অত্যন্ত স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন এবং তিনি সারাটি জীবন অসুস্থদের সেবায় অতিবাহিত করেছেন।

এরপর আরও একজন বন্ধু লিখেন, ডাক্তার মনসূর সাহেবের হাতে আরোগ্য ছিল আর তিনি অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। দক্ষিণ ইয়েমেনে সকল সংবাদপত্র তার মৃত্যুর খবর বিভিন্ন শিরোনামে ছাপিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি খবরের শিরোনাম হলো- 'প্রখ্যাত ডাক্তারের হত্যা'। 'সর্বাপেক্ষ বিখ্যাত ডাক্তারের মৃত্যু'। 'প্রখ্যাত ডাক্তারের অপহরণ' ইত্যাদি ইত্যাদি।

কেউ একজন আমাকে লিখেছে যে, আল্লাহ্‌র কৃপায় তার মাধ্যমে এখন ইয়েমেনে আহমদীয়াতের অনেক প্রচার হয়েছে। হতে পারে তবলীগের মাধ্যমও হবে এটি। আল্লাহ্ করুন যেন এমন হয়। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন, তার মর্যাদা উন্নীত করুন, তার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ও মনোবল দিন, পরিস্থিতি অনুকূল হোক। বর্তমানে সেখানে আমাদের ছোটো একটি জামা'ত রয়েছে। সেখানে বাকি যারা কারাবন্দি রয়েছেন, আল্লাহ তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ- মোকাররম সালাহ্ উদ্দিন মুহাম্মদ সালেহ আব্দুল কাদের ওদে সাহেবের, যিনি আহমদীয়া জামা'ত কাবাবীর-এর আমীর জনাব শরীফ ওদে সাহেবের পিতা ছিলেন। ৩১ জানুয়ারি তার বুকে ব্যাথা অনুভূত হলে হাসপাতালে অপারেশন করার সময় প্রায় ৮৫ বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম একজন মূসী ছিলেন। তিনি তার অবর্তমানে নিজ পরিবারে তার স্ত্রী, তিন পুত্র– মুহাম্মদ শরীফ ওদে, মুনির ওদে, আমীর ওদে সাহেব এবং এক কন্যা মিনাল ওদে সাহেবাকে রেখে গিয়েছেন। তার নাতি নাতনীরাও রয়েছে। তার দুই নাতি স্নেহের মাসরূর মুনির ওদে ও বশির উদ্দিন মাহমুদ ওদে যথাক্রমে ইউকে জামেয়া এবং কানাডা জামেয়ায় অধ্যয়ন রত রয়েছে।

শরীফ ওদে সাহেব লেখেন, মরহুমের দাদা আলহাজ সালেহ আবদুল কাদের ওদে সাহেব ফিলিস্তিনের প্রাথমিক আহমদীদের মাঝে অন্যতম ছিলেন। যিনি ১৯২৮ সালে বয়আত করেছিলেন। তার পরে মরহুমের প্রপিতামহও বয়আত করেছিলেন। কিছুদিন পর মরহুমের পিতা মুহাম্মদ ওদে সাহেবও বয়আত করেন। এভাবে আল্লাহ্‌র কৃপায় মরহুমের পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ সবাই আহমদী হয়েছিলেন। তিনি ১৯৩৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি জন্মগত আহমদী ছিলেন। তার বয়স যখন ১৪ বছর ছিল তখন এক তীব্র শীতের দিনে কোনো কাজে বাহিরে যান। শীতের জন্য উপযোগী কাপড় না পরার কারণে তার শরীর হীমশীতল হয়ে যায়। যার কারণে অচেতন হয়ে পড়েন। অনেক খোঁজাখুঁজি পর তার খোঁজ পাওয়া যায়, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অত্যন্ত দুঃখ ও নৈরাশ্যকর অবস্থা ছিল। ডাক্তারের ভাষ্য ছিল- তার জীবিত থাকা একটি নিদর্শন হবে আর সে বেঁচে গেলেও কখনো সন্তান হবে না। এ কারণে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এর সমীপে মুরব্বী চৌধুরী মুহাম্মদ শরীফ সাহেব লিখেন, এরপর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে আরোগ্যও লাভ হয়, বিবাহও হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ তা'লা তাকে তিন পুত্র ও এক কন্যা দান করেছেন। মরহুম নিজ পিতার ন্যায় সারাজীবন মুবাল্লেগদের সেবায় অগ্রগামী ছিলেন। একইভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মেহমানদের গভীর আন্তরিকতার সাথে সেবা করতেন। শোক প্রকাশে আগত প্রত্যেক ব্যক্তি এর সাক্ষ্য দিয়েছে।

শরীফ ওদে সাহেব বলেন, অতিথিদের তার আতিথেয়তা গ্রহণের বদঅভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। অতিথিরা তার কাছে গিয়ে আতিথ্য গ্রহণ করা পছন্দ করত। একজন পাদরি সাক্ষাতের জন্য আসার কথা ছিল। তিনি প্রথমে জানতে চান যে, তার পিতা আছেন কি-না। তাকে যখন জানানো হয় যে, তিনি বাহিরে গিয়েছেন তখন তিনি বলেন যে, তাহলে আমিও আসবো না; যখন তিনি আসবেন তখন আসবো যেন তার আতিথেয়তায় পরিতৃপ্ত হতে পারি। মরহুম অসহায় ও অভাবীদেরও খেয়াল রাখতেন। তাদের পেছনে খরচ করতেন। এমন নও মোবাঈন, যাদের পরিবার তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিল তারা কাবাবীর এসে বসতি স্থাপন করে। মরহুম তাদের সবাইকে স্নেহশীল পিতার ন্যায় আগলে রেখেছেন। তার মৃত্যুতে একজন মহিলা বলেন, আমার স্বামী অধিকাংশ সময় মরহুমের সাথে অতিবাহিত করত, এখন সে বলছে- জানি না এখন কার কাছে যাবো। এরপর শরীফ সাহেব বলেন, আমাদের পিতা ব্যবহারিক আচরণের মাধ্যমে আমাদের তরবিয়ত করতেন। বোঝানোর পরিবর্তে নিজের আচরণের মাধ্যমে বলতেন যে, এভাবে কাজ করো। তার পড়াশোনার খুব আগ্রহ ছিল। জামা'তের বইপুস্তকের কোনো না কোনো বই তার অধ্যয়নে থাকতো। এজন্য তার জ্ঞানের পরিধি অনেক ব্যপক ছিল। বৃদ্ধাবস্থাতেও আমাদের কোনো প্রয়োজন তার হয়নি। আমাদের কোনো সাহায্যের তার প্রয়োজন পড়েনি, বরং তিনি আমাদের সাহায্য করতেন। আর এই বিষয়ে আনন্দিত ছিলেন যে, তার সন্তানরা জামা'তের সেবা করছে।

তার দৌহিত্রী ডাক্তার ইয়াসমিন বলেন, আমি কয়েক বছর যাবৎ আমার নানা নানীর কাছে তাদের ঘরে বাস করছিলাম। আমি দেখলাম, আমার মরহুম নানা নামায, তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত এবং অধিকাংশ সময় মসজিদ ও জামা'তের সেন্টারে অতিবাহিত করতেন। অতিথিদের জন্য খাবার রান্না করা, তাদের সেবা করা এবং জামা'তের কেন্দ্রের মেরামত ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করা তার দৈনন্দিন রীতি ছিল। জামা'তের পুস্তক পাঠ করা তার প্রিয় শখ ছিল, এমনকি তার মৃত্যুর দিনও তার বিছানায় একটি পুস্তক খোলা অবস্থায় ছিল। তিনি বলেন, ঘরে কিছু মেরামত করানোর প্রয়োজন ছিল। আমার মরহুম নানা নানীকে বলেন,

আমাদের এগুলোর প্রয়োজন নেই, কেননা আমরা এখন দ্রুতই মৃত্যু বরণ করব। এজন্য ঘরের মেরামতের জন্য যে অর্থ একত্রিত হয়েছে সেটা অভাবীদের মাঝে বিতরণ করে দেয়াই ভালো। ডাক্তাররা অপারেশনের সময় দেখেন তার হৃৎপিণ্ড শুধু দুর্বল নয় বরং তার ধমনীগুলোও প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। আর তারা বিস্মিত ছিলেন যে, তিনি এই সময় পর্যন্ত তিনি কীভাবে চলাফেরা করছিলেন। এটি তার দোয়া ছিল যে, সক্ষম অবস্থাতেই যেন তার মৃত্যু আসে। আর এমনই হয়, শেষ দিন পর্যন্ত চলাফেরা করেছেন, কারো মুখাপেক্ষী হতে হয়নি। শরীফ ওদে সাহেব বলেন, তিনি অন্যদের জন্য মন খুলে খরচ করতেন। একদিন একজন বয়স্ক আত্মীয় সাহায্যের জন্য বলেন, তখন তার পকেটে যা কিছু ছিল সব দিয়ে দেন। মরহুম মওলানা ফযল ইলাহী বশীর সাহেব যখন কাবাবীরে মুরব্বী ও মুবাল্লেগ ছিলেন, একবার তিনি মরহুমের কাছে কাবাবীর মসজিদের জন্য চাঁদা চাইলেন, মরহুমের কাছে সে সময় কোথাও থেকে বড়ো অংকের অর্থ এসেছিল। তিনি সেই সাকুল্য অর্থ মসজিদের জন্য দিয়ে দেন। একজন খাদেম লিখেন, তার হার্নিয়ার অপারেশন হয়, আমি তার স্বাস্থ্যের খবরাখবর জানতে চাইলে তিনি বলেন, ব্যথা অনেক বেশি। আমি বললাম, এই অবস্থায় আপনি এখানে কাজ করছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, সামান্য কিছু কাজ করেছি। কিছু জিনিস তুলে এদিকে সেদিকে রেখেছি আর একটি দরজা ভাঙা ছিল সেটি মেরামত করেছি। তিনি (খাদেম) বলেন, আপনার অপারেশন হয়েছে (তাই) এত ভারী কাজ করবেন না। (প্রত্যুত্তরে) তিনি বলেন, এই কাজ ছাড়া আমি থাকতে পারবো না। জামা'তের সেবা-ই আমার কাজ।

ফিলিস্তিন নিবাসী সাইফ উদ্দীন আবু আসাদ বলেন, আমরা শ্রদ্ধেয় সালাহ্ উদ্দীন ওদে সাহেবের মাঝে কল্যাণ ও মঙ্গল বৈ আর কিছু দেখিনি। কাবাবীরে অবস্থানকালে তাকে জামা'তের একজন খুবই নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্ব পেয়েছি। সবার জন্য গভীর ভালোবাসা রাখতেন এবং প্রত্যেককে সাহায্য করতেন। জামা'তের আমীরের পিতা হওয়া সত্ত্বেও অতিথি সেবার দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি বলেন, তিনি যেভাবে সেবা করতেন তাতে আমার কখনো মনে হয়নি যে, তিনি জামা'তের আমীরের পিতা হবেন; (এটি) আমি অনেক পরে জানতে পেরেছি। পরম বিনয়ী ছিলেন। পরবর্তীতে কেউ আমাকে বলেন যে, ইনি তো আমীরের পিতা।

ডাক্তার আয়মান আল্ মালেকী বলেন, ফজরের নামায পড়ানোর পর সোজা লঙ্গরখানায় চলে যেতেন এবং সারাদিন কোনোরূপ ক্লান্তি ছাড়াই গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করতেন। সপ্তাহের সাত দিন-ই তার এই রুটিন ছিল। খিলাফতের প্রেমিক এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। তার পুত্র হওয়া সত্ত্বেও আমীরকে দেখলে দাঁড়িয়ে যেতেন। জামা'তের সেবা, তবলীগ এবং জামা'তের দায়িত্বাবলী পালনের ক্ষেত্রে জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে ব্যস্ত থাকতেন। এমন উদ্দীপনার দৃষ্টান্ত খুব কম মানুষের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। চারজন খলীফার যুগ তিনি পেয়েছেন এবং খিলাফত সম্পর্কে খুবই আকর্ষণীয় বা হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করতেন।

মুহাম্মদ আলাওনা সাহেব লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে, (আমি) বিশ বছর পূর্বে বয়আত করেছি, এরপর যখন আমি কাবাবীর যাই (তখন তিনি) গভীর ভালোবাসা ও নিষ্ঠার সাথে সাক্ষাৎ করেন। আমি তাকে জামা'তের সেবা করতে দেখেছি। বয়োবৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এমন নিষ্ঠার সাথে কাজ করতেন যা তরুণদের মাঝেও দেখা যায় না। অত্যন্ত দয়ালু ও সহানুভূতিশীল ছিলেন।

নমল আজওয়া সাহেবা বলেন, আমি আল্ খলীল শহরের বাসিন্দা। আমি আমার দু'সন্তান সহ যখন এখানে আসি তখন আমার কাছে (থাকার মতো) কোনো ঘর ছিল না। মরহুম আমাকে বলেন, তোমার মেয়েদেরকে আমাদের কাছে রেখে যাও আর তুমি দ্বারুয্ যিয়াফত বা অতিথিশালায় থাকো। দেড় মাস পর্যন্ত তিনি আমার মেয়েদের যত্ন-আত্তি করেছেন এবং তাদেরকে পানাহার ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছেন। তিনি আরও বলেন, মরহুম আমার জন্য একজন স্নেহশীল পিতার মতো ছিলেন। তার মৃত্যুতে আমার এমন মনে হচ্ছে যেন আমার দেহ থেকে আত্মা বের হয়ে গেছে।

কাবাবীরের মুরব্বী শামস উদ্দীন সাহেব বলেন, (মরহুম) মসজিদ এবং মিশন হাউসের কোনো পুরোনো জিনিস ফেলে দেওয়া পছন্দ করতেন না। বরং সেগুলোকে মেরামত করে একেবারে ব্যবহার উপযোগী করে দিতেন। আর এটিই সাশ্রয়ের পদ্ধতি, যা অন্যান্য স্থানেও অবলম্বন করা উচিত। অনেক সময় দেখা গেছে যে, মসজিদে যারা সাহায্যের প্রত্যাশায় আসতো মরহুম তাদের সাথেও সম্মানিত অতিথিদের ন্যায় ব্যবহার করতেন এবং তাদেরকে বসিয়ে খাবার খাওয়াতেন।

মরহুমের পৌত্রী রানা ওদে জাহাঙ্গীর সাহেবা বলেন, আমি সর্বদা আমার দাদা'কে তাহাজ্জুদের জন্য প্রত্যুষে তাড়াতাড়ি উঠতে এবং নিয়মিত পাঁচবেলার নামায পড়তে দেখেছি। তিনি বলেন আমার দাদা দরিদ্রদের অনেক খেয়াল রাখতেন। মানুষ বলতো নিজের টাকা পয়সা নিজের জন্যও খরচ করুন, কিন্তু তিনি সর্বদা বলতেন যে, আমি আমার অর্থ দরিদ্রদের দেওয়া পছন্দ করি। খোদাতালার উপর তার পূর্ণ আস্থা ছিল। খিলাফতের প্রতি অসীম ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। মরহুমের সাথে আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন। তার পদমর্যাদা সমুন্নত করুন। তার সন্তানসন্ততিদের ধৈর্য ও মনোবল দান করুন। তার পুণ্য সমূহকে ধরে রাখার তৌফিক দিন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হচ্ছে রাবওয়ার মুরব্বী সিলসিলাহ কেরামতুল্লাহ্ খাদেম সাহেবের স্ত্রী রেহানা ফরহাত সাহেবার। সম্প্রতি ২৯শে জানুয়ারি তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার বংশে আহমদিয়াতের সূচনা তার প্রপিতামহ গুজরাত নিবাসী হযরত মুন্সী জালাল উদ্দিন সাহেব (রা.)-এর মাধ্যমে হয়েছে। যার নাম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আনযামে আথমের পরিশিষ্টে ৩১৩ জন সাহাবীর ১ম সাহাবী হিসেবে লিখেছেন।

তিনি তার শোক সন্তপ্ত পরিবারে স্বামী, এক পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গিয়েছেন। তার ছেলে এহসানুল্লাহ্ সাহেব বর্তমানে মুরব্বী সিলসিলাহ হিসেবে স্পেনে সেবা করছেন। কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে মার জানাযায় অংশ নিতে পারেননি। এছাড়া আরও কিছু কারণ ছিল। তার স্বামী কেরামতুল্লাহ্ খাদেম সাহেবও ওয়াকফে জিন্দেগি মুরব্বী সিলসিলাহ্। তার জামাতা আসিফ মাহমুদ বাট সাহেবও মুরব্বী সিলসিলাহ, যিনি তানজানিয়ায় সেবা করছেন।

তার পুত্র মুরব্বী সিলসিলাহ এহসানুল্লাহ্ সাহেব লিখেছেন যে, আমাদের জন্য তিনি দোয়ার এক ভাণ্ডার ছিলেন। বিগলিত চিত্তে তাহাজ্জুদ পড়তেন। কাজ ও চলাফেরায় মসীহ্ মওউদ (আ.) ও খলীফাদের দোয়াভিত্তিক পঙক্তিগুলো গুনগুনিয়ে পাঠ করতেন আর এভাবেই সাথে থাকা বাচ্চাদেরও কবিতার পঙতিগুলো মুখস্থ হয়ে যেতো। বিভিন্ন চাঁদা ও জামা'তের কাজে নিয়মিত ছিলেন। যতদিন স্বাস্থ্য ভালো ছিল রীতিমতো জামা'তের অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণ করতেন। খুবই কৃতজ্ঞ এবং আহমদীয়াত নিয়ে গর্বকারী এক মহিলা ছিলেন।

তার মেয়ে নোমানা নুসরত সাহেবা বলেন, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার বৈশিষ্ট্য তার মাঝে উল্লেখযোগ্য ছিল। যদি কেউ প্রশংসা করে বলতো যে, একটিমাত্র ছেলে ছিল যাকে ওয়াকফ করে দিয়েছো তো তিনি বিনয় ও কৃতজ্ঞতার সূরে বলতেন যে, আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা কোথায় খুঁজে পাবো? আল্লাহ্ তা'লাকে আমি একজন দিয়েছিলাম আর এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অনেক ফেরত দিয়েছেন, অর্থাৎ নিজের পৌত্র ও দৌহিত্রদের কথা বলছেন। তিনি বলতেন সব আহমদীই ওয়াকফে জিন্দেগী।

রাবওয়াতে জন্ম নিয়েছেন ও রাবওয়ার উন্নয়নে অনেক খুশি হতেন। দৃঢ়চিত্ত কুশলী মহিলা হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। স্বল্পে সন্তুষ্ট থেকে কুশলী জীবন কাটিয়েছেন। এমনভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন যেন সব চেয়ে বেশি সুযোগ সুবিধা তিনিই পেয়েছেন। কখনো কোনো অভিযোগ করেননি যে, মুরব্বীদের ভাতা কম। বলতেন যত নেয়ামত পাচ্ছি এরূপ নেয়ামত তো আর কোথাও পাওয়া যায় না।

জামা'তের কেস এর জন্য ছেলেকে ২০১৭ সালে হিজরত করতে হয়েছে। যেভাবে আমি বলেছিলাম যে, আরও কিছু কারণ ছিল। এই কারণে পাকিস্তান যাওয়া সম্ভব হয়নি। মাতাও নিজেদের ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে পুত্রের সাথে সাক্ষাতের জন্য যেতে পারেননি, কিন্তু তিনি সর্বদা ধৈর্য ও একাগ্রতার সাথে ওয়াকফের দায়িত্ব পালনের জন্য নিজ পুত্রকে নসীহত করতেন।

তার পুত্রবধূ লিখেছেন যে, অনেক ব্যদনা ও মিনতির সাথে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতেন। অত্যন্ত পরিষ্কার ও সত্য স্বপ্ন দেখতেন যা এত স্পষ্টভাবে পূর্ণও হতো যে, আমরা আশ্চর্যান্বিত হতাম। তিনি আরও লিখেছেন যে, ছেলের কেসের জন্য হিজরত করতে হয়েছে আর নিজে অসুস্থতার জন্য ছেলের নিকট যেতে পারতেন না। কিন্তু কখনো ছেলের অভাব বোধ করার কথা প্রকাশ করেননি বরং সর্বদা নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সাথে ওয়াকফের দায়িত্ব পালন করার জন্য নসীহত করতেন। এ কথা বলতেন যে, আজকাল তো অনেক সুযোগ সুবিধা রয়েছে, সর্বদা যোগাযোগ থাকে। কখনো নিজের মমতাকে তার ছেলের ওয়াকফের পথে বাধা হতে দেননি। কেউ তাকে বলেছিল এখন তো দীর্ঘ সময় পার হয়েছে, খলীফার নিকট লিখুন যেন সেখানে গিয়ে ছেলের সাথে দেখা করার সুযোগ পান, আপনার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তিনি বলেন, আমি আমার পুত্রকে ওয়াকফ করে দিয়েছি, তাই আমি এরূপ দাবি করতে পারবো না। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন। তার মর্যাদা উন্নীত করুন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ও মনোবল ধরে রাখার তৌফিক দিন। (আমীন)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)